শনিবার, ২৬ শ্রাবণ, ১৪২৪
বর্ষ : ৬, সংখ্যা : ১১

ক্ষমতায় টিকে থাকতে নওয়াজের মুখে গণতন্ত্রের বুলি

পাকিস্তানের শীর্ষ আদালতে নির্দেশে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ ফের ক্ষমতার মসনদে ফিরে আসার জন্য গণতন্ত্রের বুলি আওড়াচ্ছেন। শুধু তাই নয়, নানাভাবে শীর্ষ আদালতের রায়কে কটাক্ষ করেছেন। নওয়াজ শরিফ দেশের প্রধানমন্ত্রী পদে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছেন পাক সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে। তার বিরুদ্ধে স্বজন পোষণ, ক্ষমতার অপব্যবহার, পরিবারের নামে বিদেশে কোটি কোটি ডলারের সম্পত্তি ক্রয় ইত্যাদি গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এ নিয়ে পানামা পেপার্স প্রকাশিত হয়েছে। শীর্ষ আদালতের রায়ের পর তাঁর পক্ষে জনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে নওয়াজ শরিফ দেশে গণতন্ত্রের রায় রক্ষার জন্য পাক জনগণের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। সম্প্রতি তিনি লাহোরে দলীয় কর্মীদের এক সমাবেশে বলেছেন, এটা বেদনার যে দেশের ৭০ বছরের ইতিহাসে কোনও প্রধানমন্ত্রী তার কার্যকালের মেয়াদ পূর্ণ করতে পারেননি। গড়ে প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রী ১ থেকে দেড় বছর দেশ শাসন করেছেন। ভাল কথা, কিন্তু কেন তার পূর্বসুরীরা মেয়াদপূর্ণ করতে পারেননি, সে ব্যাপার উহ্য রেখেছেন চতুর রাজনীতিক নওয়াজ শরিফ। আসলে নিজের টি অপকর্ম ও ক্ষমতার অপব্যহার করে সম্পত্তি ক্রয়ের অভিযোগ তিনি এড়িয়ে যাচ্ছেন।

পাকিস্তানে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মতো বিচার বিভাগও এক বড় স্তম্ভ। কিন্তু ওই দেশে গণতন্ত্রের কোনও মূল্য নেই। দেশে শেষ কথা বলে গোয়েন্দা দফতর এবং সেনাবাহিনী। প্রধানমন্ত্রীরা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হলেও ক্ষমতায় থাকতে তাকিয়ে থাকেন সেনাপ্রধানের দিকে। তবে দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত নওয়াজের পাশে পাক সেনাবাহিনী নেই। এখন বিস্ময়কর হল, যে নওয়াজ শরিফ ক্ষমতায় থাকার সময়ে গণতন্ত্রকে পদদলিত করেছেন, তিনিই ময়দানে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্র বাঁচানোর ডাক দিচ্ছেন, অবশ্য তিনি এ ও বলেছেন যে, দেশের প্রধানমন্ত্রিত্বে ফিরে যাওয়ার জন্য উৎসুক নয়। এটাই ধূর্ত রাজনীতিকের বাহাদুরি।

অমৃতবার্তা

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ (মাষ্টারের প্রতি)—আমি জপ করতাম্ সমাধি হ'য়ে যেত, কেমন এর ভাব? মাষ্টার(গম্ভীরভাবে)—আজ্ঞা বেশ! শ্রীরামকৃষ্ণ(সহাস্যে) সাধু! সাধু!—কিন্তু ওরা (মুখুয্যেরা) কি মনে করবে? মাষ্টার—কেন কাপ্তেন ত বলেছিলেন, আপনার বালকের অবস্থা। ঈশ্বর দর্শন করলে বালকের অবস্থা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ—আর বাল্য, পৌগণ্ড, যুবা। পৌগণ্ড অবস্থায় ফচকিমি করে, হয়ত খেউর মুখ দে বেরোয়। আর যুবা অবস্থায় সিংহের ন্যায় লোক শিক্ষা দেয়। "তুমি না হয় ওদের (মুখুয্যেদের)বুঝিয়ে দিও।" মাষ্টার—আজ্ঞ, আমার বোধাতে হবে না। ওরা কি আর জানে না? শ্রীরামকৃষ্ণ ছোকরাদের সঙ্গে একটু আমোদ-আহ্লাদ করিয়া একজন ভক্তকে বলিতেছেন, " **আজ অমাবস্যা, মার ঘরে যেও।**" সন্ধ্যার পর আরতির শব্দ শুনা যাইতেছে, ঠাকুর বাবুরামকে বলিতেছেন—"চল চল। কালীঘরে।" ঠাকুর বাবুরামের সঙ্গে যাইতেছেন—মাষ্টারও সঙ্গে আছেন। হরিশ বারান্দায় বসিয়া আছেন দেখিয়া ঠাকুর বলিতেছেন, "এর আবার বুঝি ভাব লাগলো।" উঠান দিয়া চলিতে চলিতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের আরতি একটু দেখিলেন। তৎপরেই মা কালীর মন্দিরের অভিমুখে যাইতেছেন। যাইতে যাইতে হাত তুলিয়া জগন্মাতাকে ডাকিতেছেন—"মা! ওমা! ব্রহ্মময়ী!" মন্দিরের সম্মুখের চাতালে উপস্থিত হইয়া মাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। মার আরতি হইতেছে। ঠাকুর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ও চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন।

আরতি সমাপ্ত হইল। যাঁহারা আরতি দেখিতেছিলেন এককালে সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও মন্দিরের বাহিরে আসিয়া প্রণাম করিলেন। মহেন্দ্র মুখুয্যে প্রভৃতি ভক্তেরাও প্রণাম করিলেন। আজ **অমাবস্যা**। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছেন। গর্গর মাতোয়ারা!

দিনপঞ্জিকা

২৬ শ্রাবণ, ভাঃ ২১ শ্রাবণ **১২ আগস্ট**, ২৬ শাওন, সংবৎ ৫ ভাদ্রপদ বদি,১৯ জেল্কদ্। সূর্যোদয় ঘ ৫।১৫, সূর্য্যস্ত ঘ ৬।১০। **শনিবার**, পঞ্চমী রাত্রি ঘ ৯।৩৬মিঃ। উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্র দিবা ঘ ৬।১মিঃ। ধৃতিযোগ দিবা ঘ ২।৪০মিঃ। কৌলবকরণ,দিবা ঘ ১০।১৫ গতে তৈতিলকরণ, রাত্রি ঘ ৯।৩৬ গতে গরকরণ। **জন্মে**—মীনরাশি বিপ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী শনির দশা, দিবা ঘ ৬।১১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। **মৃতে**—একপাদদোষ। **কালবেলাদি** ঘ ৬।৫২ মধ্যে ও ১।১৯ গতে ২।৫৬ মধ্যে ও ৪।৩৩ গতে ৬।১০ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ৭।৩৩ মধ্যে ৩।৫২ গতে ৫।১৫ মধ্যে। **যাত্রা**—**নাই**। **শুভকর্ম্ম**—দীক্ষা, দিবা ঘ ৬।৫১ গতে১। ১৯ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। **বিবাহ**—**রাত্রি ঘ ৭।৩৩ গতে ৯।৩০ মধ্যে কুম্ভ ও মীনলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ**—পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ঘ ৯।৩৬ গতে মাসদগ্ধা। **পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত শ্রীশ্রীমনসাদেবী ও অষ্টনাগ পূজা। অমৃতযোগ**—দিবা ঘ ৯।৩২ গতে ১২।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৯।২০ গতে ১০।৩৪ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ১।৩২ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৪৬ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৬ শ্রাবণ, ভাঃ ২১ শ্রাবণ, ১২ আগস্ট, ২৬ শাওন,১৯ জেল্কদ্ উঃ ৫।১৫, অঃ ৬।১০ শনিবার, পঞ্চমী রাঃ ঘঃ ৯।৩৬।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

কন্যাসন্তানের প্রতিকূল অনুপাত, সমাজের মানসিকতা ও সরকারি নীতি

মেরি ই জন

প্রতিকূল নারী-পুরুষ অনুপাতের বিষয়টি আমাদের দেশে আজকের সমস্যা নয়। পুরুষের তুলনায় নারীর অনুপাত কম থাকায় সমস্যা চলে আসছে দিনেদনেপক্ষে ইংরেজ শাসনকাল থেকে। এক বড় সমস্যা হিসেবে ফের তা মাথাচাড়া দেয় বিশ শতকের সাতের দশকে। রাজপুত ও জাঠদের মধ্যে ঘরের কন্যাসন্তান মেরে ফেলার প্রবণতার কারণ খুঁজতে উনিশ শতকে তত্ত্বতালাশ চালিয়েছে ইংরেজ প্রশাসন। স্বাধীনতার পরও পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ক্রমাগত কমে চলার হেতু সম্পর্কে হাতড়ে বেড়িয়েছেন জনতত্ত্ববিদরা। এই ইস্যুটির মোকাবিলা বা সমাধানের বিষয়ে আকছার মতভেদ বা বিভ্রান্তি দেখা গিয়েছে আগাগোড়া। উনিশ শতকের আটের দশকের পর এক নিদারুণ খবরে শিউরে ওঠে সবাই। জানা গেল, দিল্লি, অমৃতসর, ও মুম্বাই-এর মতো বড় বড় শহরে অকাতরে চলছে কন্যাভ্রূণ হত্যা। মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বেড়ে ওঠার পর্যায়গুলির নজরদারির জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সংস্থান আছে চিকিৎসা বিজ্ঞানে। সেই প্রযুক্তির অপব্যবহার করে অনেক ক্লিনিকে ভ্রূণের লিঙ্গ পরীক্ষা করা হয় অবৈধভাবে। কন্যাভ্রূণ হলে অনেক ক্ষেত্রেই গর্ভপাত ঘটানো হয়।

ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ে জন্য প্রযুক্তির অপপ্রয়োগের জড়িত চিকিৎসকদেরই একাংশ। আইনের (প্রি-কনসেপশান অ্যান্ড প্রি-নেটাল ডায়াগনস্টিক টেকনিকস অ্যাক্ট) মাধ্যমে ভারতে এই পরীক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনের চোখে এ এক মারাত্মক অপরাধ। দোষী চিকিৎসক ও রেডিওলজিস্টদের ধরপাকরড় করে ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ বন্ধের জন্য চলে জোরদার তৎপরতা। একাজে সফল হতে কসরত করতে হয়েছে দস্তুরমতো। ক্লিনিক, চিকিৎসকমহল ও রাজ্যস্তরের নজরদারি সংস্থাগুলির অশুভ আঁতাত এই প্রচেষ্টা ভেস্তে দিতে কম কসুর করেনি। ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ণয়ে জড়িত ডাক্তারদের মুখোশ খুলে দেওয়া ও এই পরীক্ষা অবৈধ তথা অপরাধমূলক বলে আইন জারির জন্য প্রশাসনের তরফে জোরদার তৎপরতার দরকার ছিল। খুব কম সংখ্যক সরকারি কর্মী ও জেলাশাসকের মধ্যে (ব্যতিক্রম হিসাবে ফরিদাবাদ ও হায়দরাবাদের উল্লেখ করা যায়) সেই তৎপরতা লক্ষ করা গিয়েছিল। রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের বিভ জেলায় কিছু অ-সরকারি সংস্থা এবং সংবাদ মাধ্যমের স্টিং অপারেশনও ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ তথা হত্যার মতো জঘন্য অপরাধের সঙ্গে যুক্ত চিকিৎসকদের মুখোশ খুলে দিতে এগিয়ে আসে। কেউ কেউ অবশ্য সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই তৎপরতার কারণে সার্বিকভাবে গর্ভপাতের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। যা আদৌ কাঙ্খিত নয়। ভারতে মহিলাদের গর্ভপাতের অধিকার কখনওই পুরোপুরি তাদের নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর নির্ভর করে না। বরং আমাদের পরিবার পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে একে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভ্রূণ হত্যাবিরোধী তৎপরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গর্ভপাতের সুযোগ মেলা মহিলাদের পক্ষে আরও শক্ত হয়ে ওঠার আশংকা ছিল। মনে রাখতে হবে, কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদের গর্ভপাত করাটা নিতান্ত জরুরি হয়ে পড়ে।

মানসিকতার বিষয়টি ফের ভেবে দেখা

মানুষ কেন ছেলে না মেয়ে এভাবে লিঙ্গ ভেদাভেদ নিয়ে এত বাড়াবাড়ি করে? সাধারণ মত হল, মানসিক গঠন বা দৃষ্টিভঙ্গি এজন্য দায়ী। সমস্যার মূল কারণ, মানুষের মানসিক গড়ন ও সেজন্য চাই তার বদল—একথা আমরা শুনে থাকি হামেশাই। এই পরিভাষার আদত অর্থটা কি? অভিধানের ভাষায়, মানসিক গড়ন বলতে বোঝায় 'প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি কারও আস্থা, অটুট বিশ্বাস।' দৃষ্টান্ত হিসেবে অভিধান উল্লেখ করেছে 'মনে হয় অঞ্চলটি মধ্যযুগের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আটকে।' কন্যা না পুত্র—এভাবে লিঙ্গ নির্বাচন প্রথা সম্পর্কে ধারণা ও তার বিরোধিতা করার প্রসঙ্গে আমার মনে হয় এই সংজ্ঞা এবং উদাহরণ খুব ভালোভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। আমার বিশ্বাস করি যে, এই প্রথা মেনে চলার জন্য দোষী পরিবারগুলি পুত্র ও কন্যা নিয়ে অনড় ধারণায় ভুগছে। তাদের মতামত কন্যাদের অবমূল্যায়নকারী সাবেকি ধ্যানধারণায় আটকে। এর আর একটা মানে, তাদের মানসিক গড়ন বদলানোর উচিত--একথা বলার সময় আমরা চাই, সাবেকিয়ানা কিঞ্চিৎ ঝোড়ে ফেলে তারা একটু আধুনিক মনের হয়ে উঠুক। কন্যাশিশুর প্রতিকূল অনুপাত নিয়ে আমাদের গবেষণার, ভিত্তিতে, আমি মনে করি, সমস্যাটি বোঝার ব্যাপারে থামতি আছে ঢের। এভাবে চিন্তা করার সময় আমরা ধরে নিই, এসব মানুষদের চিন্তাভাবনা সমকালের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

কন্যা নয়, পুত্র--এই সিদ্ধান্ত নেবার সময় আজকাল পরিবারগুলি কী ভাবে, তা আরও মনোযোগ দিয়ে দেখা যাক। বস্তাপচা ধ্যানধারণা নয়, তাদের আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণে কী ধরনের সম্পদ জোগাড় করতে সক্ষম হবে, সেই প্রত্যাশার উপর ভর দিয়ে পরিবারগুলি ভবিষ্যতের পরিকল্পনা ঠিক করে। সুতরাং, হ্যাঁ, একথা ঠিক যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত নিয়েই আমাদের কারবার। কিন্তু এসব চিন্তাভাবনা রূপ পেয়েছে সমকালীন আর্থ-সামাজিক পরিবেশে।

অন্যভাবে বলতে গেলে, পরিবারগুলি এখন শিশুর জন্মদান ও তাদের মানুষ করে তোলার সঙ্গতি নিয়ে টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে চলছে। এ এক খুব গতিশীল ও জটিল সম্পর্ক। এক্ষেত্রে হালের পরিবেশ ব্যাপক ও গভীর প্রভাব ফেলে পরিবারগুলির উপর (বিশদ জানার জন্য দেখা যেতে পারে জন ও অন্যান্যের ২০০৮; ইউএন উইমেন ২০১৫)।

এর আরও মানে দাঁড়ায়, আমাদের প্রশ্ন করতে হবে, উনিশ শতকে আটের দশক অবধি পাওয়া প্রযুক্তিগুলি ছাড়াও, গত কয়েকটি দশকের অন্য কোন ধরনের অগ্রগতি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলেছে? কোন ধরনের পরিবার বিশেষ করে প্রভাবিত? সবার আগে লক্ষণীয় যে, ১৯৯০-এর দশক থেকে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশ হার বিস্তর বাড়ার সঙ্গে সমাপতন বা মিল আছে কন্যাশিশুর অনুপাত কমে যাবার সময়কালের। অর্থনীতির ব্যাপক বাড়ন্ত এবং ভোলবদল সত্ত্বেও, নির্মম সত্যিটা হল, এই বিকাশ হয়েছে খুব অসম এবং একটু বেশি বয়সিদের জন্য যথেষ্ট নতুন কাজের সুযোগ করে দেওয়া যায়নি। এর মধ্যে, সবচেয়ে বেশি ভুগতে হয়েছে মেয়েদের।

লোকশিক্ষক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

গদাধর রানা পর্ব ২

তখন অবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেব দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর নীচে ধ্যানমগ্ন। কীসের ধ্যান তাঁর? জগদম্বা বা ঈশ্বরের কৃপাবারিতে অভিসিঞ্চিত হয়ে অবোধ, পথহারা সব মানুষের চরিত্রের উদ্বোধন তথা আত্মবিকাশ ঘটুক, যাকে তিনি আত্মপ্রতিষ্ঠা বলে বলতে চান না। তিনি চাইতেন তামাম মানুষ পরানুকরণ মুক্ত হয়ে আত্মবিশ্বাসী হোক। এই যেন শিক্ষাপ্রদানের মূলে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব লোকশিক্ষকের ভূমিকায় থেকে সাধারণ মানুষকে আদর্শ ও ন্যায়ধর্মের জীবনপথ দেখাতে চেয়ে নিজে হতে চাইলেন চিরন্তন শুভসুন্দর স্থিতধী জীবনচর্চা ও চর্যার নিপুণ কারিগর ও জীবনদর্শনের বলিষ্ঠ রূপকার। চতুর্দিকের ডামাডোলের গোলকধাঁধায় তিনি পথ দেখাতেই এসেছিলেন—কোন পথে গেলে মানুষ তার আত্মবিস্তৃতি থেকে অব্যাহতি পাবেন, মানবজীবনের মূল পাথেয় যে ধর্ম বা ঈশ্বর তাঁকে চিরকালের জন্য আঁকড়ে ধরে রাখতে পারবে। তথাকথিত কলকাতার বোদ্ধা বিদ্বান ব্রহ্মসমাজকে কেমন করে যথার্থ বাঁচা এবং বাঁচানোর শিক্ষা দিতে হয়, কেমন করে ঐশ্বরীক শক্তির কাছে নত হতে হয়, সেজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর সবার আগে কলকাতার মানুষের চিত্ত ও প্রবৃত্তি শুদ্ধিকে টারগেট করেছিলেন। তাই তো তিনি সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ব্যাপী সুকঠোর সাধন অন্তে সিদ্ধিলাভ করার পরে ভারতের সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ কলকাতায় পৌঁছে প্রথম মহাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন ব্রাহ্মণদের। নিজে হিন্দু হয়েও ব্রাহ্মণ মন্দিরে মাথা নুইয়ে প্রণাম করলেন। তারপর ব্রাহ্মণমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম বলে মাথা নত করে প্রণাম করলেন। ঠাকুরের এভাবে দিনের পর দিন ঘটনা পরম্পরায় নমস্কার করা দেখে ওঁরাও ক্রমেই ভূমিষ্ঠ হয়ে নমস্কার করতে শিখলো। ঠাকুর অনেক ব্রাহ্মানেতার মাথাকেই এভাবে মাটিতে নত করিয়ে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে সনভাবনা ওআদর্শযুক্ত জীবনপথের সন্ধান দিয়েছিলেন—এযে কত বড় মাপের লোকশিক্ষা, কত সহজেই তাঁর স্বীয় আচরণের প্রদর্শনে সম্ভবপর হয়েছিল তথা নিজেকে সর্বসমক্ষে তিনি নিবেদিতপ্রাণরূপে সমর্পিত করেছিলেন—তা কি ভাবা যায়? আমরা জানি, ঠাকুর যখন অবতীর্ণ হয়েছিলেন—তাঁকে মূলত তিনটি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে সনাতন উদার হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছিল—যার মধ্য দিয়েই তাঁর অর্জিত পরাচৈতন্যের ভিত্তিতে জাগতিক প্রকাশভঙ্গী উদ্ভাসিক সুমুখ সমাজের বুকে আছড়ে পড়েছিল। তিনি ১) সংকীর্ণ ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে ২) আগ্রাসী খ্রীস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে এবং ৩) উল্লাসিক ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে লড়াই করে জগতে সাম্যিক শুদ্ধি ও জাগরণ আনার মানসে সর্বপ্রথম দফায় লোকশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। দেবমানব যুগাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব সদাই থাকতেন ঈশ্বরীয়ভাবে বিভোর। স্বীয় অনুভূতি প্রসঙ্গে একদা তাঁর শ্রীমুখের উক্তি, 'এখানকার অনুভূতি বেদবেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।' তা সত্ত্বেও জাগতিক ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনে মানবিক সদ্গুণাবলীর এক অপূর্ব প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় তাঁর মধ্যে। বলা যেতে পারে—তাঁর সাধনার ভিত্তি ছিল মানবিককতাই। দীনদুঃখীদের প্রতি তাঁর অহেতুক করুণাধারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঝরে পড়তে দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। এই হেন সপ্রশংসভাব প্রদর্শন করার মধ্য দিয়েও তো পরোক্ষে লোকশিক্ষকের কাজটাই তিনি করেছিলেন। যিনি লোকসাধারণকে শিক্ষা দেবার জন্যে পৃথিবীতে আবির্ভূত হন তিনিই প্রকৃত অর্থে লোকশিক্ষক। এদিক দিয়ে বলতে গেলে,শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন একজন সত্যিকার লোকশিক্ষক, যিনি ভারতীয় দর্শনের উচ্চতম ভাবমার্গ এবং ভারতীয় লোকায়ত জীবনচর্যাকে একত্রিত করতে পেরেছিলেন এবং জগতের মানুষের শিক্ষায় তা তুলে ধরতে পেরেছিলেন। বলাই বাহুল্য, উনবিংশ শতাব্দীর আত্মসর্বস্ব পাশ্চাত্যশিক্ষাভিসানী ভারতীয় সমাজসীবনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবই সাহসের সঙ্গে বলেছিলেন, 'আগে ডুব দাও'—ডুব দিয়ে রত্ন তোলো, তারপর কাজ। তিনি জানতেন কেউ ডুব দিতে চায় না। সাধন নাই। ভজন নাই, বিবেকবৈরাগ্য নাই। মুমুক্ষা চেতনা নাই। দু চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার। শ্রীরামকৃষ্ণদেবই আধুনিক যুগের প্রকৃত অর্থে, সার্থক লোকশিক্ষক, যিনি জীবনচর্চা ও লোকায়ত জীবন একসাথে বাঁধতে পেরেছিলেন। ঈশ্বরজ্ঞান হলে এবং তাঁর কাছ থেকে চারপাশ পেলে তখনই একজন বলতে পারেন—আমি ঈশ্বরের দূত, আমি তাঁর আদেশ পেয়েছি, তোমরা সকলে অবগত হও। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন—ঈশ্বরলাভের উপায় চারটি। জ্ঞান, কর্ম, ধ্যান এবং ভক্তি। কিন্তু সব রোগীর জন্য তো চিকিৎসক একই ওষুধের নির্দেশ দেন না।

সম্পাদক সমীপেষু

টেবিল পাখায় ঘর ঠান্ডা

গরম থেকে বাঁচার জন্য আমরা যে সমস্ত যন্ত্র ব্যবহার করি তার মধ্যে অন্যতম হলো টেবিল পাখা। এই টেবিল পাখার সাহায্যে ঘরের হাওয়াকে একটু বেশি শীতল করার পদ্ধতি বানাতেই এই চিঠি। লক্ষ্য করে দেখবেন সন্ধ্যের পর থেকে ঘরের ভিতরের তুলনায় বাইরের হাওয়াটা একটু দ্রুত ঠান্ডা হয় বাইরের এই ঠান্ডা হাওয়াকে টেনে ঘরে ঢোকাতে পারলেই ঘরটা অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা হবে। এরজন্য একটা সহজ পদ্ধতি অবলম্বন করা যায়। একটা টেবিল পাখাকে জানালায় বসান। পাখার মুখটা থাকবে ঘরের দিকে। পাখাটাকে যথা সম্ভব বাইরের দিক চেপে অর্থাৎ গরাদ বা গ্রীলের দিক ঘেঁষে বসান। তারপর পাখার মাথাটা দরাদের সাথে বেঁধে দিন যাতে পাখাটা পড়ে না যায়। এরপর পাখাটা চালিয়ে দিন। দেখবেন ওই পাখার টানে বাইরের অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা হাওয়া সোঁ সোঁ করে আপনার ঘরে ঢুকে পড়ছে। ব্যস! ঘরের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করবে। লক্ষ্য রাখবেন, ঘরের ভিতরের হাওয়া যেন পাখার পিছন দিকে না যেতে পারে। তাহলে ওই গরম হাওয়াই আবার পাখার টানে সামনে, দিকে ঘরের ভিতর ফিরে আসবে। এর জন্য পাখাটার দুই পাশ ও উপরের অংশটা আড়াল করে দিন। পাটা, কাঠ বোর্ড ইত্যাদি দিয়ে আড়াল করতে পারেন। জানালার পাল্লা দিয়ে পাখার দুই পাশ আটকে দিতে পারেন। পরীক্ষা করে দেখুন। সাফল্য পেলে মতামত জানান। এই পদ্ধতি প্রচলিত হয়ে গেলে পাখা নির্মাতারা এমন পাখা নির্মাণ করবেন যেটা সহজেই জানালায় বসানো যাবে। যাই হোক, পদ্ধতিটা প্রয়োগ করে দেখুন।

অসিতবরণ দত্ত, কাটোয়া

উন্নয়ন ও সমস্যা

চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, রাজাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।.....সম্পাদকীয় দপ্তর।

লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভিন,
কলকাতা-৭০০০১৪

পাঠকের দরবারে

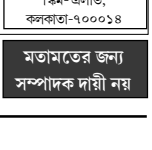

চিঠি পাঠান
লিপি
পি-১১, সি আই টি রোড,
স্কিম-এলভিন,
কলকাতা-৭০০০১৪

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়